পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি দেশের জন্য পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশগত নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে সরকার ঐকান্তিকভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 'রূপকল্প- ২০২১' এ পরিবেশগত উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা', ও 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০' প্রণয়নসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় 'Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF)' গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ওজোন স্তর রক্ষা এবং পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কারণে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অবক্ষয়ের ফলে বাংলাদেশের প্রতিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বড় ধরনের বাঁধার সৃষ্টি করছে। পরিবেশগত এ সব সমস্যা সমাধানপূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিরামহীনভাবে কাজ করছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার কর্তৃক নিরলস প্রচেষ্টা চলছে। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণ

সুইডেনের স্টকহোমে 'UN Conference of the Human Environment' ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। একে পরিবেশ বিষয়ক বৈশ্বিক আয়োজনের মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সম্মেলনের সফল ফলাফল স্বরূপ জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনকে বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অন্যতম উদ্যোগ হিসেবে ধরা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত হয় কিয়োটো প্রটোকল। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলা

১৯৯৫ সাল থেকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCC) এর আওতায় প্রতি বছর জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন বা Conference of the Parties (COP) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে মূলত UNFCCC এর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। ২০১৫ সালে প্যারিসে ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP 21) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৯৫টি দেশের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement) শীর্ষক একটি জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি গৃহীত হয়। ২০১৬ সালে মরক্কোর মারাকেশে অনুষ্ঠিত ২২তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (COP 22) প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত এপেক্স বডি 'Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)'এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী (Paris Agreement Work Programs) ২০১৮ সালের মধ্যে

প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৭ সালে জার্মানির বনে ২৩তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP 23) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১৮ সালে পোল্যান্ডের ক্যাটোয়িচ শহরে অনুষ্ঠিত হয় ২৪তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP-24)। সম্মেলনে 'Paris Agreement Work Programs' গৃহীত হয়েছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২০২৪ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পরপর প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ঝুঁকি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের নির্দোষ শিকার। এ দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম বিপন্ন। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত হওয়ার প্রবণতা বেশি। অধিকন্তু, এই ভূ-খন্ড এশিয়ার বৃষ্টিবহুল এলাকা দ্বারাও পরিবেষ্টিত। এখানকার ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উপরে। 'Headley Center for Climate Prediction and Research (HCCPR)' এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সালে ৪০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে। জার্মানভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'জার্মানওয়াচ' এর ২০১৯ সালের গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম।

Providing Regional Climates for Impact Studies (PRECIS) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৯৬১-১৯৯০ সময়ের তুলনায় ২০৩০, ২০৫০ এবং ২০৭০ সালে যথাক্রমে প্রায় ৪ শতাংশ, ২.৩ শতাংশ এবং ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, General Circulation Model (GCM) এর প্রক্ষেপণ অনুসারে ২১০০ সালে বাংলাদেশে তাপমাত্রা ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বৃষ্টিপাত ৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে প্রতি ৩-৫ বছরে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে, অবকাঠামো, বাসস্থান, কৃষি এবং জীবিকার ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ঝড় জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিতেও থাকে। 'Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC)' এর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সালে বাংলাদেশের ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হারিয়ে যাবে।

২০১০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রণীত 'Economics of Adaptation to Climate Change: Bangladesh' প্রতিবেদন বলা হয়েছে যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবেলায় ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং আবর্তক ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৫,৫১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার 'Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)' প্রণয়ন করেছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এমন একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। BCCSAP কর্ম-পরিকল্পনায় ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ৪৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কর্ম-পরিকল্পনায় উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) গঠন করা হয়েছে। এটি একটি স্বতন্ত্র তহবিল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এ ধরনের একটি তহবিল গঠন করেছে। ফান্ডটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে সর্বমোট সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে UNFCCC এর আওতায় 'National Adaptation Plan (NAP)' প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একটি 'NAP Road Map' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ UNFCCC'র সক্রিয় সদস্য হিসাবে অভিযোজন ও প্রশমন খাতে বেশ কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করে 'Intended Nationally Determined Contributions (INDC)' শীর্ষক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ১০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রাসহ বাংলাদেশ তার নিজস্ব সক্ষমতায় ৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। INDC বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ 'NDC Implementation Road Map' এবং বিদ্যুৎ, শিল্প ও যানবাহনখাতে 'INDC Mitigation Action Plan' প্রণয়ন করা হচ্ছে।

এছাড়াও, 'Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA)' প্রণয়ন এবং পরিবেশ, বন ও

জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে 'Climate Change Unit' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধিকন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকার বেশ কিছু কর্মসূচি/কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' প্রণীত হয়েছে। টেকসই পানি, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশকে রূপান্তর করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করা এ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া পরিকল্পনাটিতে ৬টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। অভীষ্টগুলো হলো: (১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; (খ) পানির নিরাপত্তা ও পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি, (গ) সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; (ঘ) জলাভূমি ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা; (ঙ) অন্তঃ ও আন্ত-দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং (চ) ভূমি ও পানিসম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ সকল অভীষ্ট অর্জনের জন্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০'তে জাতীয় পর্যায়ে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও মিঠা পানি বিষয়ক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, বাংলাদেশ অভিযোজন, প্রশমন, জলবায়ু অর্থায়ন, জলবায়ু প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও স্থানান্তর বিষয়ক বিভিন্ন বৈঠকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

জলবায়ু বিপর্যয়ে দেশীয় অর্থায়ন

'জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ (আইবিএফসিআর)' প্রকল্পের সহযোগিতায় অর্থ বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণ করে 'জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়ন' নামে একটি বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু বাজেট নিয়ে 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন' নামে দ্বিতীয় জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঐ ২০টি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ছিল মোট জাতীয় বাজেটের ৪৫.৮৪ শতাংশ। আর জলবায়ু পরিবর্তন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮.৮২ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বরাদ্দ ছিল ৫.৩৭ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সরকার নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬৮৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬২৪টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবং অবশিষ্ট ৬৩টি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জলবায়ু সংকটে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন

আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের একটি অন্যতম প্রধান উৎস হতে যাচ্ছে 'Green Climate Fund (GCF)'। বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ ফান্ডে প্রতিনিধিত্ব করছে। GCF থেকে জলবায়ু অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে 'National Designated Authority' সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'Infrastructure Development Company Limited (IDCOL)' ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) জলবায়ু অর্থায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের (National Implementing Entity) স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত ৮৫.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশের ৩টি প্রকল্প GCF অনুমোদন করেছে।

বায়ুদূষণ জনিত সমস্যা নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম

বিভিন্ন উৎস হতে বিশেষত ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে অবকাঠামো নির্মাণ এবং যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুদূষণ ক্রমশ বাড়ছে। মানব স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন, যানবাহন ও কলকারখানা সৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বায়ুদূষণজনিত পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

বায়ুমান পরিবীক্ষণ

নিয়মিত বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন

(CAMS) চালু রয়েছে। এ সকল স্টেশনের মাধ্যমে ঐ শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) পরিমাণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে।

যানবাহনের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়ির ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ইট ভাটায় সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

দেশে নির্মাণশিল্পের ব্যাপকতার কারণে ইটের চাহিদা বাড়ছে। ফলে যততত্র ইটের ভাটা গড়ে উঠেছে। এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইট ভাটা থেকে দূষণ কমানোর লক্ষ্যে পুরাতন পদ্ধতির ইট ভাটার পরিবর্তে জ্বালানি সাশ্রয়ী, বায়ুদূষণ রোধে কার্যকর ও আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব ইট ভাটা স্থাপনে কাজ করছে পরিবেশ অধিদপ্তর। ইট নির্মাণ শিল্পকে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি জুলাই ২০১৪ থেকে কার্যকর হয়েছে। ২০১৯ সালে আইনটিকে বাস্তবসম্মতভাবে সংশোধন করে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯' জারি করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৫,৫৭১টি ইট ভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, যা দেশে বিদ্যমান ইট ভাটার ৭২ শতাংশ।

পরিবেশ দূষণকারী অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ২৯১টি অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৩.২১ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা, শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা, বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার প্রশমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করে থাকে। এছাড়া, নিজস্ব লোকবল ও যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার শর্তও ছাড়পত্রে উল্লেখ করে দেয়া হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর ৫৫,৮০১টি ছাড়পত্র প্রদান করেছে এবং একই সময়ে ৭৬,৭৬৮টি ছাড়পত্র নবায়ন করেছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

ইটিপি (ETP) স্থাপন: পানি দূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ফলে অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ইটিপি স্থাপনযোগ্য ২,১৫৫টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ১,৭৪৭টি ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ১০৩টি ইউনিটে ইটিপি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপন্ন তরল বর্জ্য প্রকৃতিতে নির্গমণ না করে পরিশোধনপূর্বক পুনঃব্যবহার করছে। ২০১৪ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর মোট ৫০৩টি তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম: 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন'এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১৮৮টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এসব অভিযানে ৬.৯৩ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযানঃ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শাখাসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছে। পাশাপাশি র‍্যাব, পুলিশ, সিটিকর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সারাদেশে পলিথিন বিরোধী অভিযান চালানোর

জন্য ৮টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে মোট ১৯৭টি অভিযান পরিচালনা করে ১৫৫.৫৫ টন অবৈধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে এবং ৪.২৯ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ গৃহস্থালী বর্জ্য কর্তৃক দুর্গন্ধ ছড়ানো ও গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন সমস্যা নিরসণপূর্বক পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে শহরের জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ২২ টন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে ৮ টন, রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ১৬ টন এবং কক্সবাজার পৌরসভায় ১২ টন উৎপাদন ক্ষমতার কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ কম্পোস্ট প্ল্যান্টে জৈবসার উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ শুরু হয়েছে। এছাড়া, ফেনী ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভায় ২টি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জলবায়ু ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও মানুষের অবিবেচক কর্মকান্ডের ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য এখন হুমকীর সম্মুখীন। এ কারণে সংবিধানে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬' প্রণীত হয়েছে।

ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান জাতিসংঘ ঘোষিত 'জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা, ২০১১-২০২০' এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে 'National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), 2016-2021' প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ কর্ম-পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো:

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ (Ecologically Critical Area-ECA): গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে এগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে দেশের একমাত্র কোরাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনের জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এছাড়া, দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে সংরক্ষণের কাজ চলছে।

উপকূলীয় ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে নানা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসুলা, সোনাদিয়া দ্বীপ ও হাকালুকি হাওরে 'Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social Protection' শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে।

ব্লু-ইকোনোমি সংক্রান্ত কার্যক্রম: সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রদূষণ রোধ, সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করাও ব্লু ইকোনমির অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী 'জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় ও সমুদ্রসম্পদ এবং প্রতিবেশ ও জীব সম্পদের সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি' এবং 'সমুদ্র প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দূষণের প্রভাব পরিবীক্ষণ' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একাধিক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে।

সামুদ্রিক দূষণ পরিবীক্ষণ: সমুদ্র দূষণ মনিটরিংয়ের জন্য বঙ্গোপসাগরের ৪টি পয়েন্ট যথা-কর্ণফুলি মোহনা, পতেঙ্গা সৈকত থেকে এক কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখী, পতেঙ্গা চরপাড়া, সিইপিজেড থেকে এক কিলোমিটার সোজা সমুদ্র অভিমুখে নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। পরিবীক্ষণ ফলাফল বিশ্লেষণ করে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ডিও এর মান ৬.৩-৮.৫, সমুদ্রের পানির অম্লতা (pH) এর মান ৭.০-৮.৪, সার্বিক দ্রবীভূত বস্তু কণা (TDS) এর মান ৪,৮২৯-১৩,৩৯১ এর মধ্যে পাওয়া গেছে ।

এছাড়াও, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর 'Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis' শীর্ষক একটি গবেষণা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ গবেষণার

ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট-এর অর্থায়নে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপনপূর্বক কৃষি, পানি সম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানি সম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণ' শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ওজোন স্তর সংরক্ষণ

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে। এই প্রটোকলের পরবর্তী সংশোধনীগুলোও অনুমোদন করে। সরকার ১৯৯৫ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করে। ১৯৯৬ সালে 'ওজোন সেল' গঠন করা হয়েছে। এ সেল মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকার ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করেছে। এছাড়া, ওজোন স্তর রক্ষায় বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্টদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের এ অনন্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২ ও ২০১৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকলের সফল বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর 'ওজোন স্তর রক্ষা বৈশ্বিক ও জাতীয় উদ্যোগ শীর্ষক' বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট **(২০১৬-২০৩০)** এর অন্যান্য অভীষ্টের ন্যায় পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৩টি অভীষ্ট সরাসরি পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত।

১৩ অভীষ্টে 'জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ' এর কথা বলা হয়েছে। এ অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে প্রতি ১ লক্ষ জনগণের মধ্যে মৃত্যু, নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে ৬.৫০০ জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১,৫০০ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। SDGs: Bangladesh Progress Report-2018' অনুযায়ী বর্তমানে এ সংখ্যা ১২,৮৮১ জন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ করছে। 'Disaster Risk Reduction Strategies of Bangladesh (2016-20)' প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪ অভীষ্টে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার' এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ অভীষ্টের অন্যতম একটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সামুদ্রিক এলাকার ২.৫ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। SDGs: Bangladesh Progress Report-2018' অনুযায়ী বর্তমানে সামুদ্রিক এলাকার ২.০৫ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা।

এসডিজি'র ১৫ অভীষ্ট হচ্ছে 'স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারের পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়া মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ'। এ অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে মোট ভূমির ২০ শতাংশ বনভূমি স্থাপন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে দেশের মোট ভূমির ১৭.৫ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। এ অভীষ্ট অর্জনে দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বনভূমির বৃক্ষ নিধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা তৈরি করা হচ্ছে এবং দু'টি শকুন অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি ২০১১ সালে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বমোট ৪,৯৫৪ কোটি টাকা পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন করেছে। উল্লিখিত সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ৩৩,৬১৯টি রেটিংকৃত প্রকল্পের মধ্যে ২৮,৫৩৬টি প্রকল্পে মোট ১,৪৪৩.০৩ কোটি টাকা অর্থায়ন করেছে। সৌর শক্তি, বায়োগ্যাস প্লান্ট ও এ্যাফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ন্যায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯ সালে পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম তৈরি করে। বর্তমানে এটি পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ এর জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম নামে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্কিমের আওতায় কারখানার কর্ম পরিবেশ ও

নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্যে ২৫.৮২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

ইট ভাটার চুল্লীর দক্ষতা উন্নয়ন করে কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং জ্বালানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক 'Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় চলতি অর্থবছরে ১৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১২টি উপ-প্রকল্পে ২০৯.২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বন সংরক্ষণ

বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর বন অধিদপ্তরের আওতাধীন। অবশিষ্ট ০.৭২ হেক্টর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন। অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত বনভূমির মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.২০ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। এছাড়াও দেশের সর্বত্র প্রায় ০.৭৭ মিলিয়ন হেক্টর বসতবাড়ি এবং প্রান্তিক পতিত ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদনে আবৃত।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় অংশীদারিত্বভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুর ফলে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছে। বন মহাপরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বনের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন অধিদপ্তর কাজ করছে। এছাড়া, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উন্নয়নে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে ১০টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৫টি কারিগরি প্রকল্প। এছাড়াও, চলতি অর্থবছরে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বন অধিদপ্তর ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সামাজিক বনায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও সামাজিক বনায়ন গুরুত্বপূর্ন অবদান রয়েছে। 'সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪' সংশোধন করে উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সরকারি বনে উপকারভোগীদের বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সাথে ৬ লক্ষাধিক উপকারভোগী সম্পৃক্ত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১,৭০,৫৯৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ৩১৪.৫৪ কোটি টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়ন সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অধিকন্তু, এই কর্মসূচি মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ সম্পদের উপর ট্যাক্সোনমিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। মাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ করাই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া, ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সংগৃহীত উদ্ভিদ সম্পদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে থাকে। সংস্থাটি দেশের উদ্ভিদ সম্পদের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানটি 'রেড ডাটা বুক অব ভাস্কুলার প্লান্টস অব বাংলাদেশ, ভলিউম-২' শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এর মাধ্যমে দেশের বিপন্ন উদ্ভিদসমূহের তথ্যসম্বলিত বই প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে 'সার্ভে অব ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চট্রগ্রাম এন্ড দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস্' শীর্ষক একটি প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে মূলত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের অনুসন্ধান করে নমুনা সংরক্ষণ ও বই রচনা করা হবে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

দেশের বন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট। দেশের বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই সংস্থাটির প্রধান কাজ। বর্তমানে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ৫৩টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় টেকসই সবুজ বেষ্টনী গড়ে উপকূলীয় চরাঞ্চলে কেওড়া বনের ভেতর মিশ্র

ম্যানগ্রোভ সৃজনে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। এছাড়াও, বিলুপ্তপ্রায় কিছু উদ্ভিদ টিকিয়ে রাখতে নার্সারি ও বনায়ন কৌশলের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ সালের সিডর, ২০০৯ সালের আইলা এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যার মত দুর্যোগ এ দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এছাড়া, প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগ বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। জনদুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষত দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। এর ফলে বাংলাদেশকে একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

(ক) আইন,নীতি,বিধি ও চুক্তি সংক্রান্ত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে বজ্রপাত ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধন করা হয়েছে।
- 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৬' প্রকাশ করা হয়েছে।
- 'দুর্যোগ পরবর্তী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ 'Asian Disaster Reduction Centre (ADRC)', 'Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)', 'Asian Ministerial Conference on Disaster Reduction (AMCDR)' এবং 'International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) ' এর সদস্যভুক্ত হয়েছে।

(খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- ২০১৫ সালে জাপানের সেনদাই নগরীতে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত 'Sendai Framework for Disaster Risk Reduction' অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।
- দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল এলাকার জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যার স্থানভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর ইনানডেশন ম্যাপ/ রিস্ক ম্যাপ ফর স্টর্ম সার্জ প্রস্তুত করা হয়েছে। এ মানচিত্র থেকে আশ্রয়কেন্দ্র, এখানকার ঘর-বাড়ি, রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচু করতে হবে এর ধারণা পাওয়া যাবে।
- কার্যকর দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে 'Incident Management System (IMS)' সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ হচ্ছে। এছাড়া, ভূমিকম্প পরবর্তী ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট নগরীর জন্য পৃথক 'Debris Management Plan' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

(গ) সচেতনতা ও শিক্ষামূলক পদক্ষেপ/ ব্যবস্থা

- দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরে 'Damage and Need Assessment (DNA) Cell' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সকল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের DNA সফট্ওয়ারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- 'Multi-Hazard Risk and Vulnerable Assessment Cell' স্থাপন করা হয়েছে। সারা দেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, খরা, প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত এই আটটি বড় ধরনের আপদের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঘ) চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

- ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণঃ গ্রামীণ রাস্তায় জলাবদ্ধতা দূর করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে মোট ১০,৪৪৫টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ২,৯৩৭টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণাধীন আছে।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রামীণ রাস্তায় সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পের আওতায় সমতলের গ্রামীণ রাস্তায় ১২ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪৬৮টি কালভার্ট ১৩৩.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

- গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহের টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিংবোন বন্ড (এইচবিবি) প্রকল্প: মূলত কাবিখা ও টিআর প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ কাঁচা সড়ক নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির আওতায়ও গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ কিঃমিঃ মাটির রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রতি বছর রাস্তাগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। এমন পরিস্থিতিতে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমানোর জন্যে হেরিংবোন বন্ড (এইচবিবি) প্রকল্পটি নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩,১৪৫.৫০ কিঃমিঃ রাস্তা এইচবিবি করা হবে। ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় ১,০৬৭.৫০ কিলেমিটার রাস্তা হেরিং বোন বন্ড করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২,০৭৮ কিলোমিটার রাস্তার কাজ চলতি অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকিতে অবস্থিত অবকাঠামোসমূহের পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নত করতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে অত্যধিক ঝুঁকিপ্রবণ ১২টি জেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ও ৩৫টি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হবে

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম:

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ দায়িত্ব পালন করছে। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ইতোমধ্যে ৮১৩.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। আরও ৪৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পগুলো উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন সংক্রান্ত। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্যা ও লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ, জলবদ্ধতা নিরসন, পানির সহজলভ্যতা ও সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার ফলে প্রকল্পের উপকারভোগী জনগনের জীবনমানের প্রভুত উন্নতি হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।